১১
জেলের জীবন

আমি আগে বলেছি যে জেলখানায় সময় কাটানো একটা বিরাট সমস্যা। আমি কয়েক দিন পরই জেইলারকে জানাই যে আমি বাসা থেকে কিছু বই আনাতে চাই। তখন জেইলার ছিলেন মিঃ নির্মল রায় বলে এক ভদ্রলোক। তিনি রাজী হলেন। কিন্তু বললেন বইগুলি সেন্সরশিপ কমিটিতে পাঠাতে হবে। আমি তাঁকে বললাম আমি ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র, আমার বই পত্র আপনাদের সেন্সরশিপ কমিটি বুঝবে বলে মনে হয় না। পাঠাতে হবে ইউনিভার্সিটিতে। এবং সেই পদ্ধতিতে একখানা বই পেতে ছ'মাসের মতো সময় লাগবে। মিঃ রায় আমার যুক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে বই আনার অনুমতি দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি আরো অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে আমাকে যেনো কাগজ-কলম আনিয়ে নেবারও অনুমতি দেওয়া হয়। এখানেও বাধা ছিল; কিন্তু শেষে অনুমতি পেয়েছিলাম।

প্রথমে যে বইটি আনাই সেটা হলো ইংরেজী সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আগে অনেকবার পড়েছি। ভাবলাম এটার ছায়া অবলম্বন করে বাংলায় একটা ইতিহাস রচনা করলে আমার যেমন সময় কাটবে তেমনি বইটি ভবিষ্যতে যদি কখনো প্রকাশিত হয়, ছাত্রদের উপকার হবে। কিন্তু আরেক সমস্যা দেখা দিলো। আমার শরীরের অবস্থা তখন এমন যে বসে বসে লিখবার ক্ষমতা ছিলো না। কিন্তু ডিকটেশন দেবো কাকে? একদিন তিন-চার পৃষ্ঠার মতো নিজ হাতে লিখলাম। কিন্তু এতো ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে আর অগ্রসর হতে পারলাম না। আমার পরিকল্পনার কথা শুনে আয়েনউদ্দিন সাহেব বললেন তিনি ডিকটেশন নিয়ে সাহায্য করবেন। আমার বইয়ের প্রথম কয়েক অধ্যায় তিনি লিখে দিয়েছেন। এরপর তাঁকে একদিন রাজশাহী জেলে বদলী করা হয় (পরে শুনেছি ট্রেনে নেওয়ার সময় তাঁর হাতে লোহার কড়া পরানো হয়েছিলো যেনো উনি খুনী আসামী পালিয়ে যাবেন)। এবার সেলে আমাকে সাহায্য করার মতো আর কাউকে পেলাম না।

তখন জেইলারকে বললাম যে বর্তমানে জেলে বহু শিক্ষিত লোক আটক রয়েছেন তাঁদের যদি কাউকে সকাল বেলা ঘন্টা দুয়েকের মতো কাজ করতে দেওয়া হয়, আমার উপকার হবে। এবারো মিঃ রায় রাজী হয়ে গেলেন। পরদিন আমার সঙ্গে লিখতে এলেন কিশোরগঞ্জের এক ভদ্রলোক। খাতা থেকে। বলা বাহুল্য, দালাল হিসাবেই তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনিও কয়েক দিন পর অন্য জেলে বদলী হয়ে যান। এরপর আসে মুঈনউদ্দিন নামে মাগুড়ার এক ছাত্র। সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সে ছাত্র সংঘের সদস্য ছিলো। তার বাংলা ও ইংরেজী হাতের লেখা ছিলো সত্যি

মুক্তার মতো। লাইনে কোনো তারতম্য হতো না। বানান নিয়েও আমি কোন সমস্যায় পড়িনি। আমার ইংরেজী ইতিহাসের বইটি শেষ হলে সে সারা পান্ডুলিপি নতুন করে কপি করে দেয়। এর সাহায্যে আরো দুটি বই লিখেছিলাম। একটি হচ্ছে 'আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত', দ্বিতীয়টি শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের ছায়া অবলম্বনে একটি বাংলা নাটক। তার নাম দিয়েছিলাম 'প্রতিশোধ'। হ্যামলেটের ঘটনা পূর্ব বঙ্গে ঘটলে যে রূপ নিতে পারতো তাই দেখাবার চেষ্টা করেছি। রাজাকে বানিয়েছিলাম জমিদার আর মন্ত্রী পলোনিয়াসকে নায়েব আর যেহেতু আধুনিক নাটকে ভূতের অবতারণা করা যায় না, ও জায়গায় স্বপ্নের অবতারণা করেছি।

তবে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মুঈনউদ্দিন আসবার আগে কুমিল্লার সৈয়দ ইরফানুল বারীও কয়েক দিন আমাকে সাহায্য করেছিলো। সে ছিলো মওলানা ভাসানীর ভক্ত। এককালে মওলানার 'হক কথা' পত্রিকার সম্পাদনা করতো। তার কাছে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে এসময় পুলিশ ইন্সপেক্টর শামসুদ্দিন সাহেবকে অন্যত্র বদলী করে ইরফানুল বারীকে আমাদের সেলে আনা হয়।

উপরে যে সমস্ত বইয়ের কথা বলেছি সেগুলি ছাড়া আরেকটি বই আমি অনুবাদ করি। এটা হলো ওসকার ওয়াইল্ডয়ের De-Profundis. স্ত্রীর কাছে চিঠির আকারে লেখা একটা ছোট বই। তখন লেখক জেলে। কারাবাসের দুঃখের এমন মর্মস্পর্শী বিবরণ আর কখনো পড়িনি। বইটি আনিয়েছিলাম জেল লাইব্রেরী থেকে। পড়েই মনো হলো ওয়াইল্ড যে অবস্থার কথা লিখেছেন তার সাথে আছে আমাদের অবস্থার অদ্ভুত মিল। তরজমা শেষ হবার পর পান্ডুলিপি বাসার লোকজনকে দিয়ে দিই। এটা প্রকাশিত হয় আমার মেয়ে মুর্শিদার নামে । ইত্তেফাকে-দু'সংখ্যায়। শুনেছি অনেকে অনুবাদের প্রশংসা করেছেন।

আরো একটা বই নিজের হাতে লিখলাম। সেটা আমার জেলের অভিজ্ঞতার বিবরণ। দু' এক পৃষ্ঠা করে রোজ ইংরেজীতে লিখতাম। যেদিন ১৯৭৩ সালে আমি খালাস হই সেদিন শেষ পৃষ্ঠা লিখি। বইটি এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। টাইপ করা পান্ডুলিপি লন্ডনে এক বন্ধুর বাসায় রেখে এসেছি ।

বই আনবার সুযোগ পেয়ে বাসা থেকে যে সব বই আগে পড়া হয়নি সেগুলি আনিয়ে পড়তাম। এগুলির মধ্যে দু'টোর উল্লেখ করছি। একটা হলো সারব্যানটিসের (Cervantes) Don Quixote. আরেকটি রাবলের (Rabelais) Gargantua and Pantagruel. বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন প্রথমটি স্প্যানিশ, দ্বিতীয়টি ফরাসী লেখকের রচনা। দু'টোই অল্প বিস্তর আগে পড়েছিলাম, কিন্তু এবার আগাগোড়া সব কিছু পড়ে নতুন স্বাদ উপভোগ করলাম।

জেল লাইব্রেরী থেকে মাঝে মাঝে বই আনা যেত। বৃটিশ আমলে স্থাপিত এই লাইব্রেরীতে অনেক পুরনো বই ছিলো, ইংরেজী, বাংলা, উর্দু - তিন ভাষার পুস্তকই পাওয়া যেতো। আমি অনেকগুলি উর্দু নবেল আনিয়ে পড়েছি। একজন মহিলার লেখা 'রং মহল' নামক উপন্যাস পেয়েছিলাম। মোগল আমলের শেষ যুগের এক পারিবারিক চিত্র এটা। খুব ভালো লাগলো। লেখিকা হামিদা সুলতানা এ আর খাতুন বলে আরেক মহিলা ঔপন্যাসিকের সন্ধান পেয়েছিলাম। তিনি অনেকটা ইংরেজী ঔপন্যাসিক জেইন অস্টেন এর মতো। উত্তর ভারতের মুসলিম সমাজের চিত্র চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। আরো কতকগুলি উর্দু পড়েছি। এরমধ্যে ছিলেন নায়েল মালিহাবাদী। তিনি অনেক বাংলা উপন্যাসের উর্দু তরজমা করেছেন।

কারাজীবনের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে যে কত বড় পরিবর্তন ঘটে তার অনেক প্রমাণ পেলাম। একদিন রাত্রে একটা অদ্ভুত আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রথম মনে হলো এটা কোনো পাখির ডাক। কান পেতে শোনার পর টের পেলাম কে যেনো জিকির করছে। ভদ্রলোক আমাদের সেলেই থাকতেন। তাঁর নাম আবদুর রহমান বাকাউল। পরদিন সকালে জিজ্ঞাসা করায় বললেন যে গভীর রাত্রে জিকির করার এই নিয়ম তিনি কোনো বই থেকে শিখেছেন। আরেক দিন কানে এলো কান্নার শব্দ। এও আমাদের সেলে। এবারও প্রশ্ন করে জানতে পেলাম যে যিনি কান্না করছেন তার ধারণা রাত্রে কান্নাকাটি করলে আল্লাহ্ বেশী করে শুনতে পান। এ নিয়ে তর্ক করিনি। কারণ আগেই বলেছি কারো মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিলো না। কার ভাগ্যে কি আছে কেউ জানতাম না। অনেকে বলতেন আমাদের সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

সন্ধ্যার পর থেকে আরো অনেক শব্দ শুনতে পেতাম। কেউ কান্না করতো, কেউ সুর করে কোরান শরীফ পড়তো। পরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আগে কখনো কোরআন-কিতাবের ধার ধারেননি। জেলে এসে প্রথম কোরআন পড়া শিখলেন।

সবাই যে নামাজ-রোজা করতেন, তা নয়। তবে অধিকাংশের মধ্যে বিপদের দিনে ধর্মভাব ফিরে এসছিলো।

জেলে আসার কিছুকাল পরেই শুনি যে অন্যান্য সেলে আমার পরিচিত বহু লোক আটক রয়েছেন। এঁর মধ্যে ছিলেনঃ ঢাকা ইউনিভার্সিটির আরো দুই শিক্ষক-ডক্টর হাসান জামান এবং আরবী বিভাগের ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান। এঁরা দু'জন থাকতেন 'সাত সেল' সংলগ্ন 'ছয় সেলে'। বিকেল বেলা দুই একদিন মোস্তাফিজুর রহমান সেল থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়ালে আমাদের সঙ্গে দেখা হতো। হাসান জামান একেবারেই বেরুতেন না।

'সাত সেলে'র অদূরে ছিলো 'বাইশ সেল'। সেখানে থাকতেন পাবনার মতিন সাহেব এবং এডভোকেট শফিকুর রহমান। এঁরা দু'জনই ছিলেন মুসলিম লীগের লোক।

ডক্টর মালেক এবং তাঁর মন্ত্রীরা ছিলেন আরো দূরে। তাঁদের কাছেই এক সেলে রাখা হয়েছিলো জাস্টিস নুরুল ইসলামকে। ডক্টর মালেকের বিচার শেষ হবার পর তাঁকে সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হলে জেল লাইব্রেরীর দেখা শোনার ভার তাঁর উপর দেওয়া হয়েছিলো।

এ সময় ঢাকা জেলে আরো যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবুর খান এবং ফজলুল কাদের চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগে এঁদের কখনো দেখিনি। জেলে এসে প্রথম পরিচয় হয়। ফজলুল কাদের চৌধুরী জেলের আইন-কানুন একেবারে মানতে চাইতেন না। বিকেল হলেই বেড়াতে বেরুতেন। আমাদের সেলের সামনে এসেও মাঝে মাঝে কথা-বার্তা বলতেন। একদিন আমাকে বললেন 'আওয়ামী লীগ' আমাদের সাজানো বাগানটা তছনছ করে দিলো। আর দশ বছরে আমরা ইন্ডিয়াকে ছাড়িয়ে যেতাম।

চৌধুরী সাহেব ডায়াবিটিস রোগে ভুগতেন। রোজ ইনসিউলিন ইনজেকশন নিতেন। জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রায় বিনা চিকিৎসায়। তাঁর হার্টেও দোষ ছিলো। ডাক্তাররা কয়েকবার পরীক্ষা করে তাঁকে হাসপাতালে পাঠাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব এতে রাজী হননি। যখন তিনি মারা যান তখন আমি 'নিউ টেন সেলে' গিয়েছি। তাঁর পাশেই অন্য সেলে ফজলুল কাদের চৌধুরীকে রাখা হতো। একদিন মধ্যে রাত্রে সেলের বাইরের সব বাতি জ্বালানো দেখলাম। লোকজনের চলাচলের আওয়াজ এলো। কি হচ্ছিলো টের পেলাম না। সকাল বেলা শুনলাম রাত্রে ফজলুল কাদের চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন এবং ঐ রাত্রেই তাঁর লাশ জেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবী করেন যে চৌধুরী সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সেল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু জেলের কয়েদীরা কেউ এ কথার সমর্থন করেনি। সকাল ১০টার দিকে খবর এলো যে আমরা যারা লাশ দেখতে চাই তাদের হাসপাতালে যেতে দেওয়া হবে। এই দাবী নাকি তুলেছিলেন সবুর খান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা। সবার সঙ্গে আমিও গেলাম। দেখলাম ফজলুল কাদের চৌধুরীর পরিবারের লোকজন এসছে। তাঁর ছোট ছেলেটি- বোধ হয় গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী- বিলাপ করে কাঁদছে। গবর্নর মালেকের ক্যাবিনেটের সদস্য ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিনও সেখানে ছিলেন। তিনিও জোরে জোরে কাঁদছিলেন। এবং বলছিলেন যে ইতিহাসে এ রকম নিষ্ঠুরতার নজির বিরল। লাশের বুকটা খোলা ছিলো। দেখলাম কোনো ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় সারাটা অংশ বির্বণ হয়ে গেছে। এই কারণেই কেউ কেউ সন্দেহ করেছিলেন যে ফজলুল কাদের চৌধুরীর দেহে বিষের ইন্‌জেকশন দিয়ে তাঁকে মারা হয়। তবে এ সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান হয়নি।

আমি কয়েক মিনিট পরে সেলে ফিরে আসি। পথে দেখলাম আরো বহু লোকজন লাশ দেখতে যাচ্ছে। সেদিন জেল কর্তৃপক্ষ খুবই আতঙ্কিত ছিলেন। তারা ভাবছিলেন জেলে বিদ্রোহের মতো একটা কিছু ঘটতে পারে। তবে সে রকম কিছু হয়নি। কিন্তু চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুতে আমরা নতুন করে উপলব্ধি করলাম আমরা কতটা অসহায়। তাঁর মতো গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাদের মতো কয়েদীদের প্রায় বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে–এ ধারণা বদ্ধমূল হলো।

আমি অনেক পরের ঘটনা বলে ফেললাম। এবার আবার ৭২ সালের প্রথম দিকে ফিরে যাচ্ছি।

আগে উল্লেখ করেছি যে ১৯শে ডিসেম্বর যারা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তারা আমার ঘড়ি, চশমা সব কেড়ে নেয়। হাসপাতালে দেড় মাসের মধ্যে নতুন চশমা নেবার সুযোগই পাইনি। জেলেও ঢুকলাম চশমা বিহীন অবস্থায়। জেল কর্তৃপক্ষকে আমার অসুবিধার কথা বলায় একদিন এক আই স্পেস্যালিস্টকে এনে আমার চক্ষু পরীক্ষা করানো হলো। কিন্তু চশমা ওরা দিলেন না। বাসায় প্রেসক্রিপশন পাঠিয়ে চশমা কেনার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু ফ্রেমটা এতো ঢিল যে নাক থেকে পড়ে যেতো। প্রথম কয়েকদিন সূতা দিয়ে বেঁধে ওটা ব্যবহার করার চেষ্টা করি। তারপর আবার বাসায় ফেরত পাঠিয়ে ঠিক করিয়ে আনি।

শুনেছি যে বৃটিশ এবং পাকিস্তান জামানায় প্রথম শ্রেণীর কয়েদীদের ফ্যামিলির সঙ্গে সপ্তাহে একবার করে ইন্টারভ্যুর ব্যবস্থা থাকতো। আরো শুনেছি যে পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিব স্বয়ং যখনই এই জেলে আটক থাকতেন তাঁকে অবাধে ফ্যামিলি এবং তাঁর দলের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হতো। কিন্তু আমাদের ব্যাপারে মাসে মাত্র দু'বার ইন্টারভ্যুর ব্যবস্থা হলো। এর মধ্যে যোগাযোগের কোনো সম্ভাবনাই থাকতো না। সুতরাং আমরা কি উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটিয়েছি তা সহজেই অনুমেয়।

১৯ ডিসেম্বর আমি যখন মুজিব বাহিনীর কাছে ধরা পড়ি তখন আমার বড় মেয়ে মোহসেনা অন্তঃসত্তা ছিলো। ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। কিন্তু তখন সময় হয়ে এসেছে। দোসরা ফেব্রুয়ারী বাসায়ই তার ডেলিভারী হয়। কিন্তু এ খবর আমি পাই প্রায় এক সপ্তাহ পর ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম ইন্টারভ্যুর সময়। মোহসিনার আম্মা বললেন যে উনি আইজি সাহেবকে (তিনি আগে থেকে পরিচিত ছিলেন) আমাকে খবরটা জানিয়ে দেবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আইজি এ অনুরোধ রক্ষা করেননি।

এ সময় আমার জামাতা মেজর অলি আহমদ পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তরীণ হয়েছিলো। তাদের ইউনিটকে ৭১ এর জুন মাসে পশ্চিমে বদলী করা হয়। এবং ১৬ই ডিসেম্বরের পরে আর্মির অন্যান্য বাঙালী অফিসারের সঙ্গে অলি আহমদও আটক পড়ে।

তাকেও তার পুত্র সন্তান লাভের খবর জানানো সম্ভব ছিলো না। ৭৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে এরা সব ফিরে আসে। কিন্তু এখানে আসার অব্যবহিত পরই অলি আহমদকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। তার প্রধান কারণ আমার সঙ্গে তার আত্মীয়তা। এ রকম আরো অনেক অফিসার যাঁরা পাকিস্তানে আটক পড়ে ছিলেন তাঁরাও অন্যায়ভাবে চাকুরী হারান। কারণ শেখ মুজিব এদের বিশ্বাস করতেন না।

আমি বলেছি যে ৭২ সালে ঢাকা জেলে প্রায় বারো হাজারের উপর কয়েদী ছিলো। জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষে এদের দু'বেলা খাওয়ানো একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে। শুনেছি যে চব্বিশ ঘন্টা চুলা জ্বালিয়েও খাতার লোকজনকে ওরা খাবার দিতে পারতো না। এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রস্তাব করে যে এ ব্যাপারে আমরা সহযোগিতা করতে রাজী। জেইলারের সম্মতি পাবার পর ঢাকা মুসলিম লীগের ইবরাহিম হোসেন আমাদের মেসের ভার গ্রহণ করেন। আমাদের প্রাপ্য জিনিসপত্র তাঁর জিম্মায় দেওয়া হতো। তিনি ওগুলি যথাযথ রান্না বান্নার ব্যবস্থা করতেন। এর ফলে আমাদের খাদ্যের মান কিছুটা উন্নত হয়। কিন্তু বেশী কিছু করবার ক্ষমতা ইবরাহিম সাহেবের ছিলো না। কারণ রেশন ছিলো সীমিত।

সাত সেলের সঙ্গীরা

আমাদের 'সাত সেল' থেকে কয়েদী এদিক ওদিক সরে গেলে আরো নতুন লোক এখানে আসতো। কয়েক জন আমার পূর্ব পরিচিত আর কয়েকজন ছিলেন অপরিচিত। পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন সিলেটের নাসিরউদ্দিন চৌধুরী যিনি এককালে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেমব্লির সাবেক ডেপুটি স্পিকার এ টি এম আব্দুল মতিন এবং ডাক্তার আব্দুল বাসেত। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন স্কিন স্পেসালিস্ট। বহুদিন তিনি আমাদের পরিবারের চিকিৎসা করেছেন। অপরিচিতদের মধ্যে ছিলেন আদমজি মিলের দুই জেনারেল ম্যানেজার। পর পর দায়িত্ব গ্রহণ করে এঁরা শেখ মুজিবের আস্থা হারান। এবং তহবিল তছরুফের দায়ে তাঁদের জেলে পাঠানো হয়। এঁদের নাম হচ্ছে: আব্দুল আওয়াল ও মিঃ রহমান।

আবদুল আউয়াল প্রথমে অন্য সেলে ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁকে বিকেল বেলা মাঠে বেড়াতে দেখতাম। তিনি ইউনিভার্সিটি টিচারদের সঙ্গে থাকবার ইচ্ছায় জেইলারকে বলে আমাদের সেলে আসেন। অদ্ভুত লোক। পয়সার অহঙ্কার ছিলো অসম্ভব। খুব গরীবের সন্তান। ছাত্র জীবনে ছাত্র লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আদমজী মিলে একটা চাকুরী পান এবং ১৬ই ডিসেম্বরের পর যখন বাঙালীরা মিল দখল করে তখন তাঁকে জেনারেল ম্যানেজার করা হয়। উনি আমাদের অনবরত তাঁর টাকা–পয়সার কথা

শোনাতেন। রোজ এক প্যাকেট করে ৫৫৫ সিগারেট খেতেন। বাসা থেকে তাঁর জন্য আপেল-কমলা, কেক এসব জিনিস আসতো এবং সেগুলি প্রায়ই পাহারাদারদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। লোকটির আবার কবিতা লেখার শখ ছিলো। তাঁর ধারণা ছিলো তিনি একজন বড় ইন্টেলেকচুয়াল। একদিন গল্প করে শোনালেন যে আদমজীরা তাঁকে খুব বিশ্বাস করতেন। একবার তাঁকে সঙ্গে করে তারা তাঁকে রাশিয়াও নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে নাকি তিনি রাশিয়ান নারীর সাহচর্য পেয়েছিলেন। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও গর্বের সঙ্গে এসব কথা বলতে তাঁর একটুও বাধতো না। একদিন তিনি এমন এক কাণ্ড করে বসলেন যা আমাকে স্তম্ভিত করলো।

আমরা যাঁরা নামাজ পড়তাম তাঁরা ছটার সময় সেল খোলবার আগেই সেলের মধ্যে ওজু করে নিতাম। পানি গড়িয়ে পড়তো বারান্দায়। এ নিয়ে আউয়াল প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশ করতেন। আমরা সেল খোলামাত্র বেরিয়ে আধঘন্টার মতো সামনের আঙ্গিনায় পায়চারী করতাম। একদিন আমি এবং ডাক্তার বাসেত যখন পায়চারী করছি তখন আমাদের 'ফালতু' এসে উপস্থিত হওয়ায় তাকে বললাম একটু পানি ছিটিয়ে দিতে। কারণ খুব ধুলো উড়ছিলো। আমরা পায়চারী শেষ করে বোধ হয় ৮ টার দিকে সেলে ফিরে যাবো এমন সময় আব্দুল আউয়াল সেল থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে প্রশ্ন করলেন উঠানে পানি দেওয়া হলো কার হুকুমে। 'ফালতু' আমাদের কথা বলায় উনি অশ্রাব্য ভাষায় আমাদের আদ্যোপান্ত করতে শুরু করলেন। বললেন যে আমাদের ডিগ্রী আছে কিন্তু কালচার একেবারেই জানি না। এমনকি পয়সা অর্জনের কৌশলও আমরা আয়ত্ত করতে পারিনি। আব্দুল আউয়াল যেমন কালচারের চর্চা করেছেন তেমনি দু'পয়সা 'বানিয়েও' নিয়েছেন।

আমরা কেউ কথা বললাম না। বাসেত সাহেব আস্তে আস্তে করে সেলে ফিরে গেলেন। আমি প্রায় চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় আউয়ালের গালাগালি শুনলাম। এরপর যদ্দিন ছিলাম তার সঙ্গে আর একেবারেই মিশতাম না। কারণ জেলের মধ্যে এ রকম আচরণ কেউ করতে পারে এ ছিলো আমার কল্পনাতীত।

আরেক দিন আউয়াল জেলের ডাক্তারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তাঁর সামান্য অসুখ হয়েছিলো। 'ফালতু'কে পাঠান জেল ডিসপেনসারীতে ঔষধের জন্য। ডাক্তার বলে পাঠান যে রোগী না দেখে তিনি কিভাবে ঔষধ দেবেন। কিন্তু আউয়াল কিছুতেই ডিসপেনসারীতে যেতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত যখন ডাক্তার সেলে আসেন তাঁকে দেখতে, তখন তাঁকে প্রথম গালাগালি করেন এবং পরে তাঁর হাতের ছাতা কেড়ে নিয়ে তাঁকে দু-চার ঘা লাগান। দু'জনের মধ্যে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়।

আদমজীর অন্য জেনারেল ম্যানেজার মিঃ রহমান ছিলেন শান্ত প্রকৃতির। বেশী বাজে কথা বলতেন না। তবে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিলেন যে তাঁর বাড়ীতে চারটি

এয়ারকণ্ডিশনার। এবং তিনি খুব সরল জীবন-যাপন করেন বলে ইউরোপীয় খানা খান। বলতেন যে এতে তাঁর খরচও কম হয়। একবার শুনলাম, উনি ভালো ফরাসী বলতে ও পড়তে পারেন। ডাক্তার বাসেতের কাছে একটা বই ছিলো যার মধ্যে ফরাসীর উদ্ধৃতি ছিলো। তার ইংরেজী তরজমা ছিলো বইয়ের শেষে কোনো জায়গায়। আমি ডাক্তার বাসেতকে বললাম, ওঁকে বলুন ফরাসী উদ্ধৃতিটি আমাদের পড়ে শোনাতে এবং ওটার মানে বুঝিয়ে দিতে। রহমান দু'তিন শব্দের বেশী অগ্রসর হতে পারলেন না। বুঝলাম তাঁর বিদ্যা সম্পর্কে একটা অবাস্তব ধারণা সৃষ্টি করা ছিলো তাঁর মতলব।

নাসিরউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন খুব মাঝারি ডিয়ার লোক। কিন্তু জেলে এসে তিনি এক অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে শুরু করেন। সহজে কাপড় চোপড় বদলাতেন না এবং কারো খাবার পাতে কিছু বেঁচে থাকলে চেয়ে নিয়ে খেতেন। কিন্তু তাঁর মনোবল ছিলো অসাধারণ। তিনি সেই ৭২ সালেই আমাদের বলেছিলেন, আপনারা ভাববেন না, পূর্ববঙ্গ হচ্ছে জোয়ার-ভাটার দেশ। দেখবেন যারা আজ শেখ মুজিবের পূঁজো করছে কয়েক মাসের মধ্যে বিগড়ে উঠে তাঁর শাস্তি চাইবে। বাস্তবিক পক্ষে ঘটে তাই। যে পাহারাদাররা প্রথম দিকে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তথাকথিত দালালদের গালাগালি করতো, ৭২ এর শেষ দিকে যখন চাল-চিনি-কাপড়সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে, তাদের সুর বদলে যায়। তখন বলতো স্যার আপনারা ক্ষমতায় গেলে এসব কিন্তু ঠিক করে দেবেন।

এ টি এম মতিন সাহেব সকাল থেকে ১০টা ১১টা পর্যন্ত জায়নামাজের উপর কাটাতেন। অনেক দোয়া-দরুদ জানতেন বলে মনে হয়। তবে যে জিনিসটা আমার কাছে বিচিত্র মনে হয়েছে সে হলো যে প্রত্যেক দিন জায়নামাজের উপর চাঁদোয়ার মতো একটা কাপড় বেঁধে নিতেন। এর রহস্য আমি কখনো বুঝি নাই।

ডাক্তার বাসেত আর্মির অনারারী কর্ণেল - এই অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এবং তাঁর একটি দামী গাড়ী - বোধ হয় মার্সিডিজ বেঞ্জ- আটক করা হয়। বাসেত ছিলেন হার্টের রোগী। খুব ভালো করে হাঁটতেও পারতেন না। তিনি এসে তাঁর জন্য একজন স্পেশাল 'ফালতু' চেয়ে নিয়েছিলেন। লোকটির নাম ছিলো রাজ্জাক। রাত্রে বাসেত সাহেবের কামরায়ই সে ঘুমাতো এবং মাঝে মাঝে বাসেত সাহেবকে তার চাটগাঁয়ের ভাষা শেখাতো।

বাসেত সাহেবের ভালো ইংরেজী উচ্চারণ শেখার শখ ছিলো। আমার পরামর্শে হর্ণবির ডিকশনারী আনিয়ে নেন। ওটা নিয়ে আমার সাথে মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন। সেলে বসে তিনি প্রথম একটা চর্ম রোগ সম্পর্কিত বই লেখেন। ওটা শেষ হলে আর কি লিখবেন যখন ভাবছেন তখন আমি পরামর্শ দিলাম আত্মজীবনী লিখবার। বললাম, আপনি স্বাভাবিকভাবেই লিখে যান, পরে এটা সম্পাদনা করিয়ে দেওয়া হবে।

জেল থেকে বেরিয়ে শেখ তোফাজ্জল হোসেন নামক একজন সাংবাদিককে দিয়ে বইটি পরিশোধন করবার ব্যবস্থা আমি করিয়ে দিয়েছিলাম। তিন খণ্ডে ওটা বেরিয়েছে। প্রথম খণ্ডের নাম– গ্রামের নাম মিঠাখালী। জেল থেকে বেরুবার আগে আমাকে দিয়ে একটা ভূমিকাও বাসেত লিখিয়ে নেন। এই বই লিখতে তাঁকে উৎসাহ দেবার প্রধান কারণ, পাকিস্তানের কল্যাণে গ্রামের একটি সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্তের সন্তান বিলেতী–ডাক্তারী ডিগ্রী অর্জন করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এর মধ্যে আছে।

আব্দুল আউয়াল আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পর আমি জেইলারকে অনুরোধ করি আমাকে যেনো অন্য সেলে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেটা করা হয় আমার মুক্তির চারমাস আগে। বাকী সময়টা সাত সেলেই কেটেছে। মাঝখানে সপ্তাহ তিনেকের মতো জেল হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিলো। একদিন রাত্রে জেলের রুটি খাবার পর পেটের ব্যথা ও বমি শুরু হয়। ডাক্তারকে খবর দিলে সে রাত্রের মতো তিনি একটা ইনজেকশন দিয়ে যান। এবং পরদিন আমাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জেল হাসপাতালের পরিবেশ জেলের মতোই নোংরা। আমি উপর তলার যে কামরাটায় থাকতাম, সেখানে পাশাপাশি চারটি বেড ছিলো। রাত্রে আমাদের লকআপ করে রাখা হতো। খাবারটা ছিলো একটু উন্নত। রোগীরা দুধও পেতো।

এই হাসপাতালেই প্রথম ডাক্তার বাসেতকে দেখি। তিনি যখন শুনলেন যে আমিও জেলে তখন তদবির করে আমাদের সেলে আসার ব্যবস্থা করেন। হাসপাতালে আরেক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হয়। তাঁর নাম যতদূর মনে পড়ে জহুরুল হক। তিনি ছিলেন ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)–এর চিফ। পঁচিশে মার্চের পর তাঁর বাহিনীর লোকজনকে অস্ত্র নিয়ে মুজিব বাহিনীতে যোগ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু নিজে চাকরীতে বহাল থাকেন। এটা নাকি তাঁর দুর্গতির কারণ। আমাদের অনবরত বলতেন, আমি কলাবরেটর নই। কিন্তু তবু নতুন সরকারের কাছে ন্যায় বিচার পাননি। আমাদের অনেক আগেই উনি মুক্তি পেয়েছিলেন।

হাসপাতালে শিক্ষিত কয়েদী কয়েকজন সাময়িকভাবে কম্পাউণ্ডারের কাজ করতো। এদের মধ্যে মুহম্মদ কামরুজ্জামানের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতো। বর্তমানে কামরুজ্জামান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক। তবে এখনকার কামরুজ্জামানকে দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এই একাত্তর সালের ছিপছিপে তরুণ। হাসপাতালে ছিলাম দু' সপ্তাহের মতো। তারপর সেই পুরানো সেলেই ফিরে আসি। আব্দুল আউয়াল সংক্রান্ত যে ঘটনার উল্লেখ করেছি সেটা আরো অনেক পরের।

যে ইবরাহিম হোসেন আমাদের মেসের ভার নিয়েছিলেন তিনি নিয়মিতভাবে সবুর সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি তাঁর দলের লোক ছিলেন এবং

ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে ভক্তি করতেন। মাঝে মাঝে এসে খবর দিতেন যে সবুর খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনা হচ্ছে। আমাদের ভয়ের কারণ নেই। শিগগিরই মুক্ত হতে পারবো। এ রকম গুজব কয়েকবার কানে এসেছে। যদিও এতে বিশ্বাস করিনি; সাময়িকভাবে মাঝে মাঝে আশান্বিত বোধ করেছি।

এ সময়েই একদিন জেইলারের অফিসে আমার ডাক পড়ে। যেয়ে দেখলাম গণহত্যা তদন্তের জন্য শেখ মুজিব যে কমিশন গঠন করেছিলেন তাঁরা আমাকে জেরা করতে এসেছেন। ক্যাম্পাসে কি হয়েছে সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। আমি আরো কিছু জানি কিনা, সে প্রশ্নও তাঁরা করলেন। প্রসঙ্গতঃ জানালেন যে এ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তাঁরা যোগাড় করতে পেরেছেন। আমি জানতাম যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা একটা প্রহসন। গণহত্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ জেনোসাইড শব্দটির একটি রাজনৈতিক আকর্ষণ ছিলো যার অপব্যবহার আওয়ামী লীগ করতে চেয়েছিলো। '৭১ সালের জানুয়ারী–ফেব্রুয়ারীর দিকে পুলিশের গুলীতে যখন দু'–এক ব্যক্তি নিহত হয় তখনই জেনোসাইডের অভিযোগ শেখ মুজিব করতে আরম্ভ করেন। আওয়ামী লীগের একটি লোক মারা গেলেও সেটাকে 'জেনোসাইড' বলা হতো। আর '৭২ সালে 'ম্যাস–গ্রেইভ' বা গণ কবর এরা আবিষ্কার করেছে। পাক বাহিনীর নির্মমতার প্রমাণ হিসাবে এ সমস্ত গণ কবরের উল্লেখ করা হতো। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আওয়ামী লীগের লোকেরাই যে সমস্ত লোককে একাত্তর সালে হত্যা করেছিলো তাদের অস্থি, কঙ্কাল নতুন করে বের করে প্রচার করা হতো এরা সব আর্মির নিষ্ঠুরতার শিকার। তখন এর প্রতিবাদ করার কেউ নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মুজিব সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম পসন্দ সমস্ত পার্টি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

একদিন শুনলাম এক আজিব কাহিনী। আওয়ামী লীগের লোকেরা পূর্ব পাকিস্তান পতনের কয়েকদিন পরই খবর পায় যে চাটগাঁয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রায় ছয় শ' নারী আটক রয়েছে। এদের উপর নাকি পাক বাহিনী নানা পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিলো। উদ্ধারকারীদের আওয়াজ শোনামাত্র এরা নাকি চিৎকার করে বলতে থাকে, তোমরা এদিকে এসো না। কারণ আমাদের সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন অবস্থায় রাখা হয়েছে। আগে কাপড়ের ব্যবস্থা করো। তারপর নাকি কোনরূপে কাপড় পাঠিয়ে ওদের ওখান থেকে বের করে আনা হয়। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলোনা যে পাকিস্তান বাহিনীকে একটা পাশবিক দল হিসাবে চিত্রিত করার এটা ছিলো এক রকমের কৌশল।

আরেকটি গুজব শুনেছিলাম। রংপুর অঞ্চলে নাকি একটা বাঘের খাঁচা পাওয়া যায়। মুজিব বাহিনীর লোকজনকে ধরে খাঁচার ভিতর ছেড়ে দেওয়া হতো। এভাবে রোজ পাঁচ–ছ'টি লোককে বাঘে খেতো। একটা বাঘে একদিনে পাঁচ–ছ'টি লোককে হজম করতে পারে– এ রকম অদ্ভুত কথা কখনো শুনিনি কিন্তু ৭২ সালে বহু লোকে এ সব বিশ্বাস করতো।

আমি আগে বলেছি যে কয়েদীদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিলো না। এ সুযোগ প্রথম পেলাম ঈদের দিন। যদিও শরিয়ত মোতাবেক জুমআ বা ঈদের নামাজ কোনো কয়েদীর উপর ওয়াজিব নয়, জেল কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে ইমাম আনিয়ে নামাজের ব্যবস্থা করলেন। সবাই গেলাম। সেখানে প্রথমে টের পেলাম কত ধরনের লোক ৭২ সালে গ্রেফতার হয়েছিলো। ডাক্তার আব্দুল মালেক ও তার মন্ত্রীদের সাথে এই প্রথম দেখা আমার। মুসলীম লীগের জমির আলীও ছিলো। ও যখন ছাত্র তখন থেকে ওকে চিনতাম। সে একটা সুন্দর কথা বলেছিলো যা এখনও মনে আছে। বলেছিলো যে স্যার, গ্রেফতার হয়ে জেলে না এলে আমার মনে হতো আমার ঈমান নেই। কারণ, ঈমানদার কোনো ব্যক্তি তখন আর জেলের বাইরে ছিলো না।

নামাজের পর আমাদের সোজা সেলে ফিরে আসবার কথা। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ সেদিন বিশেষ কড়াকড়ি না করায় অনেকে জেলের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিলো। আমি গিয়েছিলাম হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তার মালেকের সেলে। সেখানে তাঁর মন্ত্রীরাও কেউ কেউ ছিলেন। মিনিট দশেক কাটিয়ে আবার 'সাত সেলে' ফিরে আসি।

সেদিন আমাদের সবার বাসা থেকে পোলাও কোর্মা পাঠানো হয়। সবাই আমরা মিলেমিশে খেয়েছি। কিন্তু জীবনে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই রকম নিরানন্দ ঈদ এই প্রথম।

জেলের সব কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বলা মুশকিল। অনেক কথা ভুলে গেছি। কোনো কোনো ঘটনার তারিখ মনে নেই। সেজন্য ক্রম রক্ষা না করে সব ঘটনার উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। এ কথাও বলে রাখা দরকার যে জেলের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে যেখানে ভবিষ্যত ছিলো একেবারে অনিশ্চিত সেখানে অনেক ঘটনা ঘটতো যা আমাদের বিভ্রান্ত করে ফেলতো। সব চেয়ে দুঃখ পেতাম জেলের নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের ব্যবহারে। এরা তখন সকলেই মুজিববাদী। এদের চোখে আমরা ছিলাম খুনীর আসামী। পারলে ওরা বিনা বিচারে আমাদের ফাঁসী দিয়ে দিতো।

জেল কম্পাউন্ডার

এ রকম একজন ছিলেন জেল হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার। শেখ মুজিবের অন্তরঙ্গ বন্ধু। বেশ বয়স্ক। তিনি প্রায়ই বলতেন যে বিশ্বের ইতিহাসে শেখ মুজিবের জুড়ি নেই। আরো বলতেন যে ঘরটায় শেখ মুজিব আটক ছিলেন সেটাকে একটা ন্যাশনাল মিউজিয়ামে পরিণত করা হবে। এঁর নাম আবদুর রহমান। আমি বলেছিলাম যে ইণ্ডিয়ায় মহাত্মা গান্ধী এবং নেহেরুর মতো নেতা বহুদিন বহু জেলে কাটিয়েছেন। কিন্তু ইণ্ডিয়ার কোনো জেলকে তো ন্যাশনাল মিউজিয়াম করা হয়নি। তাঁর জবাবটা এখনো আমার স্মরণ আছে। তিনি বললেন, ইণ্ডিয়া যে ভুল করেছে আমরা সে ভুল করবো না।

একদিন আমাদের শেখ মুজিবের সেই ঘরটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আর কোনো কয়েদীকে রাখা হতো না। বেশ প্রশস্ত বড় ঘর। ফ্যান লাগানো। বিছানা পাতা। একটা সাইড টেবিলও দেখলাম। শেখ মুজিবের পাইপটা পর্যন্ত আছে। এগুলো রোজই ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে রাখা হতো। শেষ পর্যন্ত ঘরটাকে আর মিউজিয়াম করা হয়নি। পরে শেখ মুজিবের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের কি হয়েছে তাও জানি না।

কম্পাউণ্ডার পুরানো লোক। অনেক কয়েদী দেখেছেন। একদিন হিন্দু টেররিস্টদের সম্পর্কে গল্প করলেন। এদের মধ্যে একজন নাকি শুধু আধ্যাত্মিক বলে লোহার সিন্দুকের তালা খুলে ফেলতে পারতো। কাঁচ ভেঙ্গে ফেলতে পারতো। উনি বললেন এ সমস্ত ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি জেল থেকে বেরুবার পর ৭৪ সালে একবার আমার বাসায় তিনি দেখা করতে এসেছিলেন। সে বছর বাংলাদেশ থেকে যে সরকারী ডেলিগেশন হজে যায় তাঁর মধ্যে তিনিও ছিলেন। ডেলিগেশনের সদস্যদের পঞ্চাশ ডলার করে প্রতিদিন ভাতা দেওয়া হতো। কম্পাউণ্ডার সাহেবের কাছে মক্কা-মদীনা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছিলাম।

কথা প্রসঙ্গে কম্পাউণ্ডার সাহেব এও বললেন যে শেখ মুজিব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কি চান? তিনি একটা ঔষধের আমদানীর পারমিটের কথা বলেন। এবং তিনি তা পেয়েও যান। এভাবে বহু টাকা উপার্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম যে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের ডক্টর খান সরওয়ার মোরশেদের ফুপা।

আরো অনেক গল্প কম্পাউণ্ডার সাহেব করলেন। ৭৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানের কথা উঠলো। বললেন যে সেদিন রাত সাড়ে এগারটায় তাঁর মেয়ে – সে ছিলো কলেজের ছাত্রী– এসে দাবী করলো যে সে শহীদ মিনারে যাবে। তিনি বললেন যে এই পবিত্র দিনে যুবতী মেয়েকে একা রাস্তায় ছেড়ে দিতে আমার একটুও দ্বিধা হয়নি।

১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এক বিব্রতকর অবস্থায় আমাদের পড়তে হয়েছিলো। এক ছোকরা কয়েদী হঠাৎ এসে আমাদের সেলে ঢুকে সবাইকে শাসিয়ে বলতে থাকে আপনারা জুতা খুলে ফেলুন। এই মহান দিবসে খালি পায়ে থাকতে হবে। ছেলেটি নিজেও কয়েদী। কিন্তু সে অবাধে কিভাবে অন্য সেলে ঢুকে এ সব কাণ্ড করছিলো তার ব্যাখ্যা কোথায়ও পাইনি। সবাই ভাবলাম জুতো না খুললে সে কি কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।

১৯৭২ সালের সবচেয়ে বড় কেলেংকারী হয় কারেন্সী নোট নিয়ে। মুজিব সরকার কয়েক কোটি নোট ছাপবার ভার দিয়েছিলো ইন্ডিয়ার উপর। মহারাষ্ট্রের নাসিক শহরে সিকিউরিটি প্রেসে এসব নোট ছাপা হয়। নোটগুলো যখন বাংলাদেশে পৌছায় তখন

আবিষ্কৃত হয় যে এর ডুপলিকেট ইন্ডিয়া রেখে দিয়েছে এবং ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ীরা এই ডুপলিকেট নোট ব্যবহার করে নতুন রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে একবারে পঙ্গু করে ফেলে। কিন্তু আশ্চর্য সারা দেশে কাগজে-পত্রে এ নিয়ে আলোচনা হলেও সরকার এ সম্বন্ধে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে বলে আমরা শুনিনি। এ রকম একটা ঘটনাও তারা চুপ করে হজম করে নেয়। তবে 'বন্ধু' রাষ্ট্রের এ ব্যবহারে আমাদের স্বাধীনতার রূপ আরো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে।

'৭২-এর মার্চ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান আর্মি বাংলাদেশে অবস্থান করে। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যখন বুঝতে পারেন যে ইন্ডিয়ান আর্মি যতদিন বাংলাদেশ দখল করে থাকবে ততদিন দুনিয়াকে বুঝানো সম্ভব হবে না যে তিনি সত্যি একটা স্বাধীন দেশ সৃষ্টি করেছেন - বাঙালী জাতির স্বার্থে। তিনি উদ্যোগ নিয়ে আর্মি সরিয়ে নেন। মার্চ মাসে তিনি আসেন বাংলাদেশ দেখতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রমনা রেসকোর্সে তাঁর জন্য একটা মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। তাঁর বক্তৃতায় ছিলো বিজেতার সুর। সেটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমরা মর্মে মর্মে এই অপমান উপলব্ধি করেছি।

ইন্ডিয়া যে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র মনে করতো না তার বহু প্রমাণ তখন পাওয়া গেছে। কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম প্রথম বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে রাজ্যপাল বলতো। রাজ্যপাল উপাধিটি ইন্ডিয়ার প্রাদেশিক গবর্নরের। বাংলাদেশের প্রেসে যখন এ নিয়ে আপত্তি করা হয় তখন ওরা সুর পাল্টে দেয়।

আমি আগে বোধ হয় উল্লেখ করেছি যে শেখ মুজিব দেশে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পর প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তখন জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। জাস্টিস চৌধুরী প্রেসিডেন্ট হিসাবে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদককে বাংলাদেশে বেড়াতে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমন্ত্রণলিপি কাগজে বের হয়েছিলো। তার ভাষা দেখে আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, যদিও বিস্মিত হইনি। প্রথমতঃ কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান একটি পত্রিকার সম্পাদককে এভাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন না। এটা প্রটোকলের খেলাপ। দ্বিতীয়তঃ তার ভাষা ছিলো একজন প্রার্থীর ভাষা। সম্পাদক মহাশয় এ দেশে এলে তিনি কৃতার্থ হবেন, এ রকমের কথা। এই ঘটনার মধ্যেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সত্যিকার রূপের সন্ধান পেলাম। এ দেশের প্রেসিডেন্টও মনে করতেন কোলকাতার একটি পত্রিকার সম্পাদকের মর্যাদা তাঁর উপরে।

তখন আরো অনেক ব্যক্তি কোলকাতায় যেয়ে অনুযোগ করেছেন যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে খাড়া করবার চেষ্টা না করে যুক্তবঙ্গের সৃষ্টি করলে

মঙ্গল হতো। এ দলের মধ্যে ঢাকা হাইকোর্টের এক জাস্টিসও ছিলেন। এঁরা একদিকে বলে বেড়িয়েছেন যে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য লড়েছিলেন, অন্যদিকে তাঁদের সত্যকার আগ্রহ ছিলো ইন্ডিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার।

'৭২ সালে ডাক্তার মালেক এবং তাঁর ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। আরো যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রজু হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন সবুর খান এবং ফজলুল কাদের চৌধুরী। আমার মামলাটা আরম্ভ হয় আরো পরে। তার আগে একদিন স্ক্রিনিং কমিটির সামনে হাজির হতে হয়েছিলো। এই স্ক্রিনিং বা বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত সরকারী এবং বেসরকারী সমস্ত চাকুরেদের রেকর্ড পরীক্ষা করার জন্য। কে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছেন আর কে করেননি এই ভিত্তিতে বহু লোককে ছাটাই করা হয়। এর মধ্যে নানা শ্রেণীর কর্মচারী ছিলো। অধিকাংশই ব্যক্তিগত শত্রুতার শিকার হয়ে পড়েন। কিন্তু করবার কিছু ছিলো না। এ রকম এক ব্যক্তির সঙ্গে জেলে দেখা হয়। তিনি বললেন যে, তিনি ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রশাসনিক দায়িত্ব চালিয়ে গেছেন এটাই তাঁর অপরাধ।

ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত স্ক্রিনিং কমিটির অফিস ছিলো ধানমন্ডিতে। আমাকে জেলের একটা বদ্ধ গাড়ীতে করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেখলাম আমার ফুপাতো ভাই সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসান উপস্থিত। সে তাঁর কিছুকাল আগে রিট করে জেল থেকে খালাস পেয়েছিলো। স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন হাই কোর্টের এক জাস্টিস এবং আরো কয়েকজন উচ্চ পদের অফিসার। আমার সঙ্গে আলোচনা হলো ইংরেজীতে। '৭১ সালে পাকিস্তান সরকার ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হত্যা সম্পর্কে যে বিবৃতিটি আমাদের দ্বারা সই করিয়ে নিয়েছিলেন তার একটি কপি আমাকে দেখানো হলো। চেয়ারম্যান বললেন, বাংলাদেশ সরকারের বিশ্বাস এটা আমার রচনা। বিবৃতিটির ভাষা ছিলো ইংরেজী এবং আমি ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ছিলাম বলে তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে ওটা আমার মুসাবিদা। আমার একটু রাগই হলো। বিবৃতিটিতে মুনির চৌধুরী, নুরুল মোমেন সহ প্রায় ৩০টি স্বাক্ষর ছিলো। কি অবস্থায় আমি সই করেছিলাম, সে কথা আগে বলেছি। এবার তাই সোজা জবাব দিলাম দ্যাটস এ লাই। কথার মানে কথাটা একবারে মিথ্যা, আমি জানতাম যে ইংরেজীর 'লাই' কথাটা ওজনে বাংলার মিথ্যার চেয়ে ভারী এবং সহজে এটা কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু সেদিন এই অমূলক অভিযোগ শুনে হঠাৎ যেনো সংযম হারিয়ে ফেললাম।

স্ক্রিনিং কমিটি আরো দু'একটা অবান্তর প্রশ্ন করলেন। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে কোলকাতায় পালিয়ে না যাওয়াটাই আমার বড় অপরাধ।